بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩রা জুন, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে পবিত্র রমযান মাস আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এই সময় দিন দীর্ঘ হওয়ার কারণে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশগুলোতে রোযা রাখা খুবই কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রত্যেক সুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা আবশ্যক। অবশ্য কোন কোন পরিস্থিতিতে রোযা রাখার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়েছে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশগুলোতে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও রোযা রাখার পরিস্থিতি যদি অনুকূল না হয় তাহলে কিছু শর্ত স্বাপেক্ষে রোযা না রাখার ছাড় রয়েছে। অনুরূপভাবে কিছু দেশ যেখানে আজকাল দিন ২২/২৩ ঘন্টা দীর্ঘ বা রাত মাত্র দেড় দুই ঘন্টার হয়ে থাকে, তা-ও পুরো রাত নয় বরং দিনের আলোই বিরাজ করে বা ঊষা ও গোধূলীর মত সময় হয়ে থাকে। তাই সেখানকার জামাতগুলোকে বলা হয়েছে তারা যেন সময়ের একটা ধারণা করে সেহেরি ও ইফতারের সময় নির্ধারণ করে নেয়। অধিকাংশ স্থানে পার্শবর্তী দেশের সময়ের ওপর নির্ভর করে বা তাদের সময়ের ধারণা অনুযায়ী আজকাল প্রায় ১৮/১৯ ঘন্টার রোযাই হবে। যদি এসব দেশে এমনটি না করা হয় তাহলে সেহরি এবং ইফতারের মাঝে কোন সময়ই থাকবে না। তাহাজ্জুদও পড়া সম্ভব হবে না। আর ইশা এবং ফজরের নামাযের সময়ও নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। যাহোক, এসব অঞ্চলের জামাতগুলো এ অনুসারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত করবেন যে, তারা কীভাবে সময় নির্ধারণ করবেন।

রোযা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি, আর তা পালন করা আবশ্যক। রোযা সম্পর্কে কিছু ছোট ছোট প্রশ্নেরও অবতারণা হয়, সেহেরি-ইফতারের সময় সম্পর্কে, অসুস্থতা সম্পর্কে, অনুরূপভাবে মুসাফির সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। খোদার অপার কৃপায় প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের জামাতে যোগ দেয়, মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কা ছাড়াও ভিন ধর্ম হতেও তারা এসে থাকে। মুসলমানদের বিভিন্ন ফির্কায় কিছু আদেশ বা শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন ফিকাহ্গত দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। এসব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যখন তারা জামাতে প্রবেশ করে তখন কিছু বিষয় তাদের মাঝে অস্থিরতার সৃষ্টি করে, তারা এর কিছু ব্যাখ্যা চায়। অনেকেই বিস্তারিত আলোচনা চায়, আবার অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করে। অনুরূপভাবে ভিন ধর্ম থেকে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করে তারা কিছু বিষয়ের আদৌ জ্ঞান রাখে না বরং তাদের জ্ঞান থাকেই না, তারা নতুনভাবে সবকিছু শিখে। তাই তাদের জন্য ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে হাকাম এবং সুবিচারক বা ন্যায়-বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন যার ইসলামী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে সব বিষয়ের

সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব ছিল এবং তিনি তা করেছেন। আর একইভাবে তাঁর সব সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করার কথা ছিল আর তিনি তা করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগে বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলের সমাধান এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদের তাঁর মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি দেখা উচিত। রোযার দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব প্রশ্ন উঠানো হয়, যেমনটি আমি বলেছি, সেই অনুসারে কিছু প্রশ্নের উত্তর বা এ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবস্থান কী ছিল বা তিনি কী নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর ফতওয়া কী ছিল, এখন আমি সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এ যুগে শরীয়তের আদেশ নিষেধ সম্পর্কে তিনি (আ.)-এর নির্দেশ এবং দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের জন্য সেই বিষয়ের শরীয়ত-সংক্রান্ত সমাধান বা সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে কথাটি স্মরণ রাখতে হবে তাহলো, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার বা অনুশীলনের ভিত্তি হলো তাক্বওয়া বা খোদাভীতি। তাক্বওয়াকে দৃষ্টিতে রেখে রোযা সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তিকে সামনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠার সাথে রোযা রাখ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু মানুষ প্রশ্ন করে, কোন কোন বালক-বালিকা প্রশ্ন করে যে, আমরা রমযান এবং ঈদ ইত্যাদি গয়ের আহমদী মুসলমানদের সাথে একই দিনে কেন করি না বা ভিন্ন সময় কেন আরম্ভ করি? প্রধানতঃ তাদের সাথে আমাদের ভিন্নতা অবশ্যই থাকতে হবে এমনটি আবশ্যক নয়, আমাদের রোযা আরম্ভ করা বা ঈদের দিন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক নয়। আর এক্ষেত্রে জেনেশুনে আমরা কোন মতভেদও করি না। এমন বছরও এসেছে এবং এসে থাকে যে, আমাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের রোযা এবং ঈদ একই দিনে হয়ে থাকে। পাকিস্তানে এবং ইসলামী বিশ্বে যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে চাঁদ দেখা কমিটি গঠিত হয়েছে, তারা যখন ঘোষণা দেয় যে, চাঁদ দেখা গেছে আর প্রত্যক্ষদর্শীর স্বাক্ষীও রয়েছে, আমরা আহমদী মুসলমানরাও সে অনুসারে আমাদের রোযা রাখি আর সে অনুসারেই আমাদের রোযা সমাপ্ত হয়, আর আমাদের ঈদও একইসাথে উদযাপিত হয় । ইউরোপিয়ান দেশে বা পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে সরকারের পক্ষ থেকে এমন চাঁদ দেখা কমিটির ব্যবস্থা নেই আর এর ঘোষণাও করা হয় না, তাই আমরা চাঁদ দেখার স্পষ্ট সম্ভাবনাকে সামনে রেখে রোযা রাখা আরম্ভ করি এবং ঈদ করি। হ্যাঁ, যদি আমাদের ধারণা ভুল হয় আর চাঁদ পূর্বেই দেখা গিয়ে থাকে তাহলে বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও মু'মিনদের স্বাক্ষ্য সাপেক্ষে, অর্থাৎ যারা চাঁদ দেখেছে তাদের সাক্ষ্য সাপেক্ষে পূর্বেই রোযা আরম্ভ করা যেতে পারে। যে চার্ট প্রণীত হয় আবশ্যক নয় যে, সে অনুসারেই রোযা আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু চাঁদ স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হওয়া উচিত বা দেখা আবশ্যক। কিন্তু এই কথা বলা যে, আমরা অবশ্যই অ-আহমদী মুসলমানদের ঘোষণা অনুসারে চাঁদ না দেখে রোযা রাখতে আরম্ভ করব আর ঈদ করব এটি ভুল বা ভ্রান্ত রীতি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- এই বিষয়টি তাঁর গ্রন্থ 'সুরমা চশমায়ে আরীয়া'-তে উল্লেখ করেছেন, হিসাব-কিতাব বা ধারণা ও অনুমানকে তিনি প্রত্যাখান করেন নি, এটিও বিজ্ঞান-

সম্মত একটি জ্ঞানের শাখা, কিন্তু দেখাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় শিক্ষাকে সহজসাধ্য করার জন্য সাধারণ মানুষকে পরিষ্কার এবং সোজা পথ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অনর্থক জটিলতার মাঝে ঠেলে দেন নি। যেমন, রোযা রাখার জন্য এই নির্দেশ দেন নি যে, যতক্ষণ তোমরা জ্যোতির্বিদদের হিসাব অনুসারে এটি নির্ধারণ করতে না পার যে, চাঁদ ২৯ না-কী ৩০ দিনের, ততক্ষণ দেখার বা রো'ইয়াতের বিষয়টিকে আদৌ বিশ্বাস করবে না। বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে হিসাবের যে নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, জ্যোতির্বিদ্যা বা গ্রহ-নক্ষত্রের যারা জ্ঞান রাখে, তারা যে নিয়ম নির্ধারণ করেছেন সেসব নিয়ম অনুসরণ আবশ্যক নয়। তাদের হিসাব যদি এটি বলে যে, চাঁদ ২৯ বা ৩০ এর হয়েছে সেই অনুসারে রোযা রাখ, চাঁদ দেখার আদৌ চেষ্টা করো না বা চাঁদ দেখার বিষয়টি আদৌ বিশ্বাস করো না, এমনটি মনে করা ভুল। তিনি (আ.) বলেন, এমন যেন না হয় যে, দেখার বিষয়টিকে তোমরা আদৌ গুরুত্ব দেবে না আর চোখ বন্ধ করে রাখবে, এটি ভুল। জ্যোতির্বিদদের সূক্ষ্ম গবেষণা কর্মকে জনসাধারণের গলার হার বানিয়ে বসা একটি অপ্রয়োজনীয় সমস্যাকে আমন্ত্রণ দেয়া এবং অনর্থক নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। শুধু এই কথার ওপর আমল করা যে, হিসাব এটি বলছে বা বিজ্ঞানের ধারণা এটি বলছে, আমরা এর বাহিরে আর কোন কিছু করবো না, এটি ঠিক নয়। তিনি বলেন, এমন ধারণা বা হিসাবের ক্ষেত্রে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। তাই সোজা এবং জনসাধারণের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা হলো, তারা যেন জ্যোতির্বিদদের মুখাপেক্ষী না থাকে অর্থাৎ যারা নক্ষত্র এবংগ্রহ-তারকার জ্ঞান রাখে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে যেন বসে না থাকে আর চাঁদ দেখার ওপর যেন নির্ভর করে। অর্থাৎ কোন তারিখে চাঁদ উদিত হয় তা নিশ্চিৎ হওয়ার জন্য যেন স্বয়ং দেখার ওপর নির্ভর করে। আর এতটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, দিনের সংখ্যা যেন ত্রিশের অধিক না হয়। চাঁদ দেখা আবশ্যক, কিন্তু দেখার চেষ্টা করার পরও যদি দেখা না যায় তাহলে জ্যোতির্বিদদের হিসাবের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। আর এই কথার ওপরও দৃষ্টি রাখা উচিত যে, দিনের সংখ্যা যেন ত্রিশের অধিক না হয়। তিনি বলেন, এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যুক্তিগত দিক থেকে চাঁদ দেখার– জ্যোতির্বিদদের হিসাবের ওপর প্রাধান্য রয়েছে। যুক্তি বা বিবেকও একথাই বলে যে, চর্মচোখে দেখার বিষয়টি অঙ্কের হিসাবের ওপর অবশ্যই প্রাধান্য রয়েছে। ইউরোপের দার্শনিকেরাও চাঁদ দেখাকে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করার সুবাদে দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার অনুবীক্ষণ এবং দুর্বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। যেহেতু ইউরোপের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান শ্রেণী এবং বিজ্ঞানীরা একথাকে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করেছে তাই তারা একে কাজে লাগিয়ে দুর্বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার মাধ্যমে তারা মহাশূন্যকে দেখে।

আমি যেমনটি বলেছি, অনেক সময় হিসাবে ভুলও হতে পারে। আর যদি ভুল হয়ে যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ একদিন পূর্বেই উদিত হয়েছে, এমন ক্ষেত্রে কোন্ নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত? একটি রোযা তো বাদ পড়ল, আমরা একদিন পরে রমযান আরম্ভ করলাম, চাঁদ পূর্বেই দেখা গেছে আর প্রমাণও পাওয়া গেছে যে, চাঁদ পূর্বেই উদিত হয়েছে, এমন ক্ষেত্রে কি করতে হবে? এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করা হয়। শিয়ালকোট থেকে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, এখানে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায় নি বরং বুধবারে দেখা গেছে অথচ বুধবারে রমযান আরম্ভ হয়ে গেছে। সেই এলাকায় মোটের ওপর এটিই হয়েছে আর এই কারণে বৃহস্পতিবারে প্রথম রোযা রাখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, রোযা বুধবারে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমাদের এখানে প্রথম রোযা রাখা হয়েছে বৃহস্পতিবারে এখন কি করা উচিত? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এর জন্য রমযানের পর একটি রোযা রাখতে হবে, যে রোযা রয়ে গেছে তা রমযানের পর রাখ।**

অনুরূপভাবে সেহেরি খাওয়ার বিষয় রয়েছে, সেহেরি খেয়ে রোযা রাখা আবশ্যক। মহানবী (সা.) আমাদেরকে এই নির্দেশই দিয়েছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলেছেন, **রোযার সময় সেহেরি খেয়ো কেননা, সেহেরি খেয়ে রোযা রাখাতে কল্যাণ নিহিত আছে।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও এই রীতি অনুসরণ করতেন আর জামাতের সদস্যদের এবং বন্ধুদেরও একই নসীহত করতেন। অনুরূপভাবে কাদিয়ানে যেসব অতিথি আসতেন তাদের জন্য রীতিমত সেহেরির ব্যবস্থা থাকতো বরং খুব ভালোভাবে আয়োজন করা হতো।

এই সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, কপুরথলার মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, আমি কাদিয়ানে মসজিদে মুবারকের সাথে সন্নিবেশিত কক্ষে অবস্থান করতাম। একবার আমি সেহেরি খাচ্ছিলাম তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন, তিনি আমাকে সেহেরি খেতে দেখে বলেন, আপনি কি সেহেরির সময় ডাল-রুটিই খান? আর তখনই ব্যবস্থাপককে ডেকে এবং বলেন, সেহেরির সময় বন্ধুদের কি এমন খাবারই দেন? আমাদের যত বন্ধু আছে তারা সফরে নয় বরং এখানে অবস্থান করছেন আর রোযা রাখছেন, তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের কী-কী খাওয়ার অভ্যাস আছে? সেহেরির সময় তারা যা খেতে পছন্দ করে সেই খাবার তাদের জন্য প্রস্তুত করা হোক। এরপর ব্যবস্থাপক আমার জন্য আরো খাবার নিয়ে আসেন কিন্তু আমি পূর্বেই খাবার শেষ করেছিলাম আর আযানও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হুযূর বলেন, খাও, আযান সময়ের পূর্বেই দেয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে চিন্তা করো না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাহাজ্জুদ পড়া এবং সেহেরি খাওয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, ডাক্তার

মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ১৮৯৫ সনে পুরো রমযান মাস আমার কাদিয়ানে কাটানোর সৌভাগ্য হয়। আমি পুরো মাস হযরত সাহেবের পেছনে তাহাজ্জুদ বা তারাবী পড়েছি। তাঁর রীতি ছিল তিনি রাতের প্রথম ভাগে বেতের পড়ে ফেলতেন আর দুই-দুই রাকাত করে রাতের শেষ প্রহরে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর এই নামাযে তিনি সবসময় প্রথম রাকাতে আয়তুল কুরসী তিলাওয়াত করতেন অর্থাৎ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ থেকে وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (সূরা আল্-বাকারা: ২৫৬) পর্যন্ত পড়তেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। আর রুকু এবং সিজদায় **'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগীস'** প্রায়শঃ পড়তেন, আর এমন সুরে পড়তেন যে, তাঁর আওয়াজ শোনা যেত। এছাড়া সেহেরি সবসময় তিনি তাহাজ্জুদের পর খেতেন। আর সেহেরি খাওয়ার ক্ষেত্রে এত বিলম্ব করতেন যে, অনেক সময় খেতে খেতে আযান হয়ে যেত। তিনি অনেক সময় আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত খাবার অব্যাহত রাখতেন। এই অধম নিবেদন করে যে, সত্যিকার অর্থে যতক্ষণ সুবহে সাদিক পূর্ব দিগন্তে দেখা না যায় ততক্ষণ সেহেরি খাওয়া বৈধ। আযানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ফজরের আযানের সময়ও সুবহে সাদিকেরই সময় হয়ে থাকে, তাই মানুষ সচরাচর আযানকে সেহেরির শেষ সীমা মনে করে। কাদিয়ানে যেহেতু সুবহে সাদিক উদিত হতেই ফজরের আযান হয়ে যায় বরং হতে পারে অনেক সময় ভুল বশতঃ বা অসাবধানতা বশতঃ এর পূর্বেও হয়ে যায়, তাই এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আযানের প্রতি কর্ণপাত করতেন না বরং সুবহে সাদিক স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সেহেরি খেতেন। সত্যিকার অর্থে শরীয়তের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, হিসাবের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন সুবহে সাদিকের সূচনা হয় তখনই খাবার ছেড়ে দেয়া উচিত, বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সুবহে সাদিকের শুভ্রতা যখন প্রকাশ পায় তখন খাবার ছেড়ে দেয়া উচিত। 'তাবায়্যুন' শব্দ এদিকেই ইঙ্গিত করছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, **বেলালের আযান শুনে সেহেরি খাওয়া বন্ধ করবে না বরং ইবনে মাক্বতূম এর আযান পর্যন্ত পানাহার অব্যাহত রাখ। ইবনে মাক্বতূম যেহেতু অন্ধ ছিলেন তাই যতক্ষণ সকাল হয়ে গেছে বলে হৈচৈ আরম্ভ না হতো ততক্ষণ তিনি আযান দিতেন না।**

গত বছর আমি এক বন্ধুকে বলেছিলাম, আপনি দীর্ঘক্ষণ সেহেরি খেতে থাকেন, একথা শুনে তিনি এরপর পুনরায় রোযা রাখেন। আমার কথা শুনেই হয়তো পরে আবার রোযা রেখেছেন। কিন্তু তিনি যদি সময়কে এর পরেও সম্প্রসারিত না করে থাকেন অর্থাৎ শুভ্রতা প্রকাশ পাওয়ার পর যদি সম্প্রসারণ না করেন তাহলে ঠিক আছে। এখনো সবাই এটি যাচাই করতে পারে। এখানে তো আযান হয় না, কিন্তু সুবহে সাদিক দেখা আবশ্যক। যখন প্রভাত উদিত হয় বা যখন শুভ্র রেখা প্রকাশিত হয় সেই সময় পর্যন্ত সেহেরি খাওয়া যেতে পারে।

সেহেরির সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তা সংক্রান্ত আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দিন

মরহুম সাহেবের স্ত্রী কাদিয়ানের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বরাতে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, ১৯০৩ সনের কথা, আমি এবং মরহুম ডাক্তার সাহেব রাঢ়কী থেকে এখানে আসি, চারদিন ছুটি ছিল। হুযূর জিজ্ঞেস করেন, সফরে রোযা রাখেন নি তো? আমরা বললাম, না। হুযূর আমাদের থাকার জন্য গোলাপি কক্ষ বরাদ্দ করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আমরা রোযা রাখব। তিনি (আ.) বলেন, ভালো কথা। এরপর বলেন, আপনারা সফরে আছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, কয়েকদিন এখানে অবস্থান করব তাই রোযা রাখার ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, ঠিক আছে আমরা আপনাদেরকে কাশ্মীরি পরোটা খাওয়াবো। আমরা ভাবছিলাম, আল্লাহ্‌ই জানে, কাশ্মীরি পরোটা না জানি কেমন হয়। যখন সেহেরির সময় হয়, আর আমরা তাহাজ্জুদ ও নফল শেষ করি, এরপর খাবার আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং সেই গোলাপি কক্ষে আসেন যা ঘরের নিচের তলায় অবস্থিত ছিল। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব উপরের তিন তলায় থাকতেন। তার বড় স্ত্রী করিম বিবি সাহেবা যাকে মৌলভীয়ানী বলা হতো, কাশ্মীরি ছিলেন, তিনি ভালো পরোটা বানাতে পারতেন। হুযূর আমাদের জন্য তার হাতে পরোটা বানিয়েছিলেন। উপর থেকে গরম গরম পরোটা আসতো আর হুযূর (আ.) নিজেই আমাদের জন্য তা নিয়ে আসতেন এবং বলতেন, ভালো করে পেট ভরে খাও। আমার লজ্জা হচ্ছিল, ডাক্তার সাহেবও লজ্জিত ছিলেন, কিন্তু আমাদের ওপর হুযূরের স্নেহ এবং বদান্যতার যে প্রভাব ছিল তার ফলে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছিল। ততক্ষণে আযান হয়ে যায়। হুযূর (আ.) আমাদের বলেন, আরো খাও, এখনো অনেক সময় আছে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৮) মানুষ এটি মেনে চলে না। আপনারা খান, এখনো অনেক সময় আছে। মুয়ায্‌যিন সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা যতক্ষণ খাচ্ছিলাম হুযূর দাঁড়িয়েছিলেন বা পায়চারি করছিলেন। যদিও ডাক্তার সাহেব বলেন যে, হুযূর! বসুন, আমি পরিচারিকাকে দিয়ে পরোটা আনিয়ে নিব বা আমার স্ত্রী নিয়ে আসবে, কিন্তু হুযূর সেকথা মানেন নি বরং অতিথি সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই খাবারে তরকারীও ছিল এবং দুধ ও সেমাই ইত্যাদিও ছিল।

ভালো খাবার অবশ্যই খান কিন্তু এক্ষেত্রেও মধ্যম পন্থা বা ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। রোযা রেখে এই সচেতনতাও থাকা উচিত যে, আমরা রোযা রেখেছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ' (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৬) এটি আমাদের জন্য অসহ্য যে, তোমরা ঈমান আনবে আর কষ্টে জর্জরিত থাকবে, তাই রোযা আবশ্যক করেছি, যেন তোমাদের কষ্ট এবং অস্বাচ্ছন্দ্য দূরীভূত হয়। এটি এমন একটি কথা যা মু'মিনকে মু'মিন বানায়। এ কথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, তিনি তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বা সহজসাধ্যতা চান, কষ্ট নয়। এর ব্যাখ্যা কী? এটি এমন একটি গুণ বা যোগ্যতা যা মু'মিনকে মু'মিনে

পরিণত করে। এর ব্যখ্যা হলো রোযায় ক্ষুধার্ত থাকা বা ধর্মের খাতিরে কুরবানী করা মানুষের জন্য ক্ষতির কোন কারণ নয় বরং এটি সম্পূর্ণভাবে কল্যাণকর বিষয়। যে মনে করে, রমযানে মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে সে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কেননা; আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা ক্ষুধার্ত ছিলে, এ জন্য আমি রমযান নির্ধারণ করেছি যেন তোমরা রুটি খেতে পার। অতএব বোঝা গেল প্রকৃত রুটি বা খাবার হলো সেটি যা আল্লাহ্ তা'লা খাওয়ান। আর এর সাথেই প্রকৃত জীবনের সম্পর্ক, এছাড়া যেই খাবার রয়েছে তা রুটি নয়, পাথর, যা তার আহারকারীর জন্য ধ্বংসের কারণ। মু'মিনের জন্য আবশ্যক হলো, যে গ্রাশই তার মুখে যায়, দেখা উচিত যে, তা কার জন্য, যদি আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটিই খাবার, আর যদি প্রবৃত্তির জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটি খাবার নয়।

সুতরাং সেহেরি যদি খোদার নির্দেশে খাওয়া হয় আর ভালোও খাওয়া হয় তাহলে তা খোদার সন্তুষ্টির জন্য। আর মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন, এতে কল্যাণ নিহিত থাকবে। আর যদি শুধু উদরপূর্তি করাই উদ্দেশ্য হয় আর ভালো খাবার খাওয়া উদ্দেশ্য হয়, স্বাদ পাওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা প্রবৃত্তির জন্য। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরপর ব্যাখ্যা করেন, সেটিই প্রকৃত পোষাক যা খোদার জন্য পরিধান করা হয়, প্রবৃত্তির জন্য যদি কেউ পরিধান করে তাহলে এমন ব্যক্তি নগ্ন। দেখ! কত সূক্ষ্মভাবে বলা হয়েছে, যতদিন আল্লাহ্র জন্য কষ্ট সহ্য না করবে ততদিন তোমরা সুযোগ পেতে পার না। এর মাধ্যমে সেসব লোকের ধারণাও খণ্ডিত হয় যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে রমযানকে মোটা হওয়ার মাধ্যম হিসেবে নেয়। কিছু মানুষ এমন আছে যাদের ওজন রমযানে কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পায়। হুযূর (আ.) বলতেন, অনেকের জন্য রমযান তেমনই যেভাবে ঘোড়ার জন্য 'খুয়েত' হয়ে থাকে, অর্থাৎ গম এবং ভুট্টার সমন্বয়ে পুষ্টিকর ঘোড়ার খাবার। এমন লোকেরা প্রায় সময় ঘি, মিষ্টি এবং তৈলাক্ত খাবার খেয়ে সেভাবে মোটা হয় যেভাবে 'খুয়েত' খেয়ে ঘোড়া মোটা হয়ে থাকে। এগুলো রমযানের বরকতকে হ্রাস করে। এখন দেখ, একদিকে নির্দেশ রয়েছে, সেহেরি খাও এতে বরকত বা কল্যাণ রয়েছে, ইফতারী খাও তাতেও বরকত নিহিত আছে, পক্ষান্তরে যদি শুধু খাদ্য পানীয়ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা বরকত এবং কল্যাণকে হ্রাস করে। তাই ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। ভালো খাবার খাও কিন্তু ভারসাম্য বজায় রেখে খাও।

সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা বৈধ নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, আমার ভালোভাবে মনে পড়ে, খুব সম্ভব মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, যিনি আজকাল একজন নেত্রীস্থানীয় লাহোরী, একবার বাহির থেকে এখানে আসেন। আসরের সময় ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জোর দিয়ে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল, তিনি বলেন, সফরে রোযা রাখা বৈধ নয়। একইভাবে একবার অসুস্থতার প্রশ্ন আসলে তিনি বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হলো, ধর্ম যে ছাড় দিয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম কাঠিন্য নয় বরং স্বাচ্ছন্দ্য শিখায়, সহজসাধ্যতা শিখায়। কেউ কেউ বলে, মুসাফির ও অসুস্থরা যদি রোযা

রাখতে পারে তাহলে রাখা উচিত, আমরা একে সঠিক মনে করি না। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি শুনিয়েছেন যে, সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা তিনি বৈধ মনে করতেন না, তার দৃষ্টিতে এমন অবস্থায় রোযা রাখলেও তা আবার পরে রাখা আবশ্যক। এটি শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ আমাদেরও একই বিশ্বাস বা একই দৃষ্টিভঙ্গী।

একবার বক্তৃতা করার সময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, আর তাহলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা সম্পর্কে এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, রোগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নির্দেশ লঙ্ঘনের ফতওয়া বর্তাবে। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে বলেন, আল্ ফযলে আপনার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা ছাপা হয়েছে যে, আহমদী বন্ধুরা যারা সালানা জলসায় আসবেন, তারা এখানে এসে রোযা রাখতে পারবেন। তখন জলসা সালানা হয় রমযান কিন্তু যারা রোযা রাখতে চেয়েছেন তারা রোযাও রেখেছে। তিনি লিখেন বা বলেন, যারা রোযা রাখবে না এবং পরে রাখবে তাদের বিরুদ্ধেও কোন আপত্তি বর্তাবে না, এই ঘোষণা ছাপা হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ সম্পর্কে প্রধানতঃ আমি একথা বলতে চাই যে, আমার কোন ফতওয়া আল্ ফযলে ছাপেনি। হ্যাঁ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন রেওয়ায়েতের বরাতে একটি ফতওয়া ছেপেছে। আসল কথা হলো, খিলাফতের প্রথম দিকে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম, কেননা, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি, তিনি মুসাফিরকে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন না। একবার আমি দেখেছি, মির্যা আইয়ূব বেগ সাহেব রমযানে এখানে (কাদিয়ানে) আসেন, তিনি রোযা রেখেছিলেন। আসরের সময় তিনি যখন পৌঁছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেলুন, সফরে রোযা রাখা অবৈধ। এটি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক এবং কথা হয়, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) চিন্তা করেন, কোথাও আবার সে হোঁচট না খায়, তাই তিনি ইবনে আরাবীর উক্তি উপস্থাপন করে বলেন, তিনিও একই কথা বলেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার ওপর এই ঘটনার যে প্রভাব ছিল সেই কারণে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম। দৈবক্রমে একবার মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব এখানে রমযান মাস কাটানোর জন্য আসেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যারা বাহির থেকে আসে আপনি তাদেরকে রোযা রাখতে বারণ করেন। কিন্তু আমার রেওয়ায়েত হলো, এখানে এক ব্যক্তি আসেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমার এখানে অবস্থান করতে হবে, আমি এর মাঝে রোযা রাখব কি রাখব না? পূর্বে দুটো ঘটনা শোনানো হয়েছে যে, মুসাফিররা কাদিয়ানে এসে রোযা রাখতো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ, আপনি রোযা রাখতে পারেন, **কেননা, কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় জন্মভূমির মর্যাদা রাখে**। যদিও মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খুব কাছের সাহাবী ছিলেন,

নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন, কিন্তু আমি শুধু তাঁর রেওয়ায়েতই গ্রহণ করিনি, এ সম্পর্কে মানুষের সাক্ষ্যও গ্রহণ করেছি। আর জানা গেছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ানে অবস্থানকালে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন, অবশ্য আসা এবং যাওয়ার দিন অনুমতি দিতেন না, সে কারণে আমার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হয়। এবার রমযানে যখন বার্ষিক জলসা ঘনিয়ে আসছিল আর প্রশ্ন উঠানো হয় যে, তাদের রোযা রাখা উচিত কি না, তখন এক ব্যক্তি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে রমযানে যখন জলসা হতো আমরা স্বয়ংঅতিথিদের সেহেরি খাইয়েছি। এই প্রেক্ষিতে আমি যে এখানে জলসায় আগমনকারীদের রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছি তা-ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই একটি ফতওয়া। পূর্বের আলেমগণ সফরে রোযা রাখা বৈধ আখ্যা দিয়ে দিতো, আর /অ-আহমদী মৌলভীরা বর্তমান সময়ের সফরকে সফর বলে গণ্য করে না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সফরে রোযা রাখতে বারণ করেছেন, আবার তিনি নিজেই এ কথা বলেন, কাদিয়ানে এসে রোযা রাখা বৈধ। এখন তাঁর একটি ফতওয়া আমরা গ্রহণ করব আর অপরটি প্রত্যাখ্যান করব এমনটি হওয়া উচিত নয়। এভাবে সেই কথাই প্রযোজ্য হবে যা এক পাঠান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে। পাঠানরা ধর্মীয় আইনশাস্ত্র বা ফিকাহ্শাস্ত্রকে কঠোরভাবে মেনে চলে। এক পাঠান ছাত্র ছিল সে পড়েছে যে, 'হরকতে কবীরা' বা খুব বেশি নড়া-চড়ায় (যেমন নামায ছেড়ে দরজা ইত্যাদি খুলে দেয়া) করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। সে হাদিসে মহানবী (সা.) সম্পর্কে পড়ল যে, তিনি একবার নামাযে নড়া-চড়া করেছেন তখন সে বলল, ও-হো, মুহাম্মদ (সা.)-এর তো তাহলে নামায নষ্ট হয়ে গেছে, কেননা কদূরী-তে এটি লেখা রয়েছে যে, 'হরকতে কবীরা' বা খুব বেশি নড়া-চড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। যেন সেই পাঠান বা মৌলভীদের শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধেই ফতওয়া দিতে আরম্ভ করে। তিনি (রা.) বলেন, অতএব যিনি এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, সফরে রোযা রাখা উচিত নয় তিনি আবার একথাও বলেছেন যে, কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় মাতৃভূমি আর এখানে রোযা রাখা বৈধ। তাই এখানে রোযা রাখা তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া অনুসারেই সঠিক, যদিও এর আরো কারণ রয়েছে।

একস্থানে অবস্থান কালে রোযা রাখা সম্পর্কে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব লিখেন, রোযা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে এক জায়গায় তিন দিনের অধিককাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হয় তাহলে তার রোযা রাখা উচিত। তিন দিনের কম যদি থাকতে হয় তাহলে রোযা রাখা উচিত নয়। আর কাদিয়ানে যদি স্বল্পকাল অবস্থান সত্ত্বেও কেউ রোযা রাখে তাহলে পরে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই কেননা; কাদিয়ান আহমদীদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি, এখানে তিন দিনের চেয়ে কম অবস্থান হলেও রোযা রাখতে পারে, কিন্তু অন্যস্থানে তিন দিন অবস্থান করলে রোযা রাখতে পারবে।

মুসাফির ও রুগ্নদের রোযা না রাখা সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি জানতে পারেন যে, লাহোর থেকে শেখ মোহাম্মদ চট্টু সাহেব নামে এক ব্যক্তি এসেছেন আর অন্যান্যরাও এসেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিনে বাহিরে আসেন, উদ্দেশ্য ছিল তিনি ভ্রমণের জন্য বাহিরে যাবেন আর বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতেরও উপলক্ষ সৃষ্টি হবে, যারা বাহির থেকে এসেছেন তাদের সাথে সাক্ষাত হবে। অন্যরাও জানতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাহিরে আসবেন। তাই অনেকেই ছোট মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে মুবারকে সমবেত হন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দরজার বাহিরে আসেন রীতি অনুসারে খোদ্দামরা পতঙ্গের মত তাঁর দিকে ছুটে যায়, তিনি শেখ সাহেবের দিকে তাকিয়ে সালামের পর বলেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি পুরোনো জানাশোনা মানুষ, আর বাবা চট্টু সাহেব বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাকীম মোহাম্মদ হোসেন কোরেশী সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, তার যেন কোন কষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব, তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করুন, যে জিনিষের প্রয়োজন হয় আমাকে জানান আর মিয়াঁ নিযাম উদ্দিন সাহেবকে তাগাদা দিন যে, খাবারের জন্য যা যথাযথ এবং তিনি যা খেতে পছন্দ করেন তা যেন প্রস্তুত করেন। হাকীম সাহেব বলেন, ইনশাআল্লাহ্ কোন কষ্ট হবে না। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি নিশ্চয় রোযা রাখেন নি। সেই ব্যক্তি বলেন, আমি রোযা রেখেছি। তিনি আহমদী ছিলেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কুরআন যেসব ছাড় দিয়েছে সেগুলো অনুসরণ করাও তাক্বওয়া। আল্লাহ্ তা'লা মুসাফির এবং রুগ্নদের অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি এবং ছাড় দিয়েছেন, তাই এই নির্দেশও মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, আমি পড়েছি অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ বা উম্মতের বুযূর্গদের মতামত হলো, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় এবং সফরে রোযা রাখে সে পাপ করে, কেননা আসল বিষয় হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, নিজের ইচ্ছায় নয় বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাঁর আনুগত্যের মাঝে নিহিত অর্থাৎ তিনি যে নির্দেশ দেন তার আনুগত্য করা উচিত। নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন কথা যোগ করা উচিত নয়। তিনি এই নির্দেশই দিয়েছেন, 'فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ' (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) এতে অন্য কোন শর্ত রাখেন নি যে, এমন সফর হতে হবে আর এ ধরণের অসুস্থতা হতে হবে। আমি সফরে রোযা রাখি না, অনুরূপভাবে অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা রাখি না, আজও আমার ভালো লাগছে না, আমার স্বাস্থ্য ভাল নেই, তাই আমি রোযা রাখি নি। হাঁটা চলা করলে রোগের প্রকপ কিছুটা কমে যায়, তাই আমি বাহিরে যাব। অতিথিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনিও যাবেন কি না, বাবা চট্টু সাহেব বলেন, না আমি যেতে পারবো না, আপনি ঘুরে আসুন। নিঃসন্দেহে (কুরআনে) এই নির্দেশ রয়েছে কিন্তু সফরে যদি কোন কষ্ট না হয় তাহলে রোযা কেন রাখা হবে না। হুযূর বলেন, এটি আপনার মতামত, কুরআন শরীফে কষ্ট হওয়া বা কষ্ট না হওয়ার কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নি। আপনি খুবই

বয়োঃবৃদ্ধ এক ব্যক্তি। জীবনের কোন ভরসা নেই, মানুষের সেই পথই অনুসরণ বা অবলম্বন করা উচিত যাতে খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং যেন সে সিরাতে মুস্তাকীম পেতে পারে। তখন বাবা সাহেব বলেন, আমি তো এ জন্যই এসেছি যেন আপনার কাছে থেকে কিছুটা উপকৃত হতে পারি, যদি এই পথই সত্য হয় তাহলে কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমরা ঔদাসিন্যের মাঝে মারা যাই। হুযূর (আ.) বলেন, এটি খুবই ভাল কথা। তিনি বলেন, আমি কিছুটা ঘুরে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে রুগ্ন এবং মুসাফিরের রোযা রাখার প্রসঙ্গ উঠে। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলেন, পূর্বের কথাই শুনিয়েছেন যে, শেখ ইবনে আরাবীর উক্তি রয়েছে, রুগ্ন এবং মুসাফির রোযার সময় রোযা রাখলেও আরোগ্য লাভের পর অর্থাৎ রমযানের পর তার জন্য পুনরায় রোযা রাখা আবশ্যক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ' (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ বা সফরে থাকে তারা রমযান মাসের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর রোযা রাখবে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে, রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির যদি নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে বা নিজের বাসনা পূর্ণ করতঃ এই দিনগুলিতে রোযা রাখে তাহলে পরবর্তীতে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশ হলো, সে পরেও রোযা রাখবে বা তাকে পরেও রোযা রাখতে হবে, পরবর্তীতে রোযা রাখা তার জন্য আবশ্যক। মধ্যবর্তী রোযা যদি সে রাখে এটি তার জন্য অতিরিক্ত একটি বিষয়, এটি তার নিজেরই সিদ্ধান্ত, এর ফলে পরে রোযা রাখা সম্পর্কে খোদার যে নির্দেশ রয়েছে সেটি টলতে পারে না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি সফর এবং অসুস্থ অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে আল্লাহ্র স্পষ্ট নির্দেশের অবাধ্যতা করে। আল্লাহ্র পরিস্কার নির্দেশ হলো, রুগ্ন এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে, সুস্থ হওয়ার পর আর সফর সমাপ্তির পর সে রোযা রাখবে। আল্লাহ্র এই নির্দেশ মেনে চলা উচিত, কেননা পরিত্রাণ লাভ হয় খোদার অনুগ্রহে, কর্মবলে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা এই কথা বলেন নি যে, রোগ সামান্য না বেশি, সফর সংক্ষিপ্ত নাকি দীর্ঘ, বরং এটি সার্বজনীন একটি নির্দেশ, এটি মেনে চলা উচিত। রুগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তারা নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হবে।

এক বর্ণনায় এসেছে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মিঞাঁ রহমতুল্লাহ্ সাহেব পিতার নাম মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় আসেন, পবিত্র রমযান মাস ছিল, আমরা সবাই গওসগড় থেকে রোযা রেখে লুধিয়ানা যাই, হুযূর আমার পিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন বা অন্য কারো কাছ থেকে জানতে পারেন, যা এখন আমার মনে নেই, গওসগড় থেকে যারা এসেছেন তারা সবাই রোযাদার। হুযূর (আ.) বলেন, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্! যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা রোযা

রাখার নির্দেশ দিয়েছেন একইভাবে সফরে রোযা না রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেলুন। যোহরের পরের কথা এটি, এরপর সবার রোযা খুলে দেয়া হয়েছে।

আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই লিখেন, মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন, প্রথম যুগের কথা, একবার রমযান মাসে এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কোন অতিথি আসেন। তিনি রোযা রেখেছিলেন, দিনের বেশির ভাগ সময় কেটে গিয়েছিল, খুব সম্ভব আসরের পরের কথা এটি। হুযূর তাকে বলেন, আপনি রোযা ভেঙ্গে ফেলুন। সেই ব্যক্তি বলেন, সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে, রোযা ভেঙ্গে কি লাভ? হুযূর বলেন, **আপনি কি বাহুবলে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চান? খোদা তা'লাকে সংকল্পবলে সন্তুষ্ট করা যায় না বরং তাঁকে আনুগত্যের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা যায়। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মুসাফির রোযা রাখবে না, সেখানে রোযা রাখা উচিত নয়।** তখন সেই অতিথি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন।

একইভাবে কপুরথলা নিবাসী হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমি এবং হযরত মুন্সী আরোড়া খান সাহেব এবং লুধিয়ানা নিবাসী হযরত খান সাহেব মোহাম্মদ খান সাহেব হুযূরের সকাশে উপস্থিত হই। রমযান মাস ছিল, আমার রোযা ছিল আর আমার সাথীরা রোযা রাখেন নি। আমরা যখন হুযূরের কাছে উপস্থিত হই তখনও সূর্যাস্তের কিছু সময় বাকী ছিল, সূর্য ছিল ডুবু ডুবু। আমার সাথীরা বললেন, জাফর আহমদ রোযা রেখেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরে যান এবং এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসেন আর বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল, সফরে রোযা রাখা উচিত নয়, আমি নির্দেশ মান্য করি। আর সেখানে অবস্থানের সুবাদে এরপর রোযা রাখতে আরম্ভ করি। পরের দিনগুলোতে যেহেতু সেখানে অবস্থান ছিল তাই পুনরায় তারা রোযা রেখেছেন। রোযার দিনগুলোতে সেখানে অবস্থানকালে একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইফতারের সময় একটি থালায় তিনটি বড় শরবতের গ্লাস নিয়ে আসেন। আমরা রোযা খুলতে যাচ্ছিলাম, আমি বললাম, হুযূর! মুন্সিজী আরোড়া খান সাহেবের এক গ্লাসে কিছু হয় না, সারাদিন রোযা রেখেছেন, আর আপনি এক গ্লাস করে পানি এনেছেন, এতে তার কিইবা হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুচকি হাসেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘরের ভেতরে গিয়ে একটি বড় জগ ভর্তি করে শরবত নিয়ে আসেন আর মুন্সিজীকে পান করান। মুন্সিজী মনে করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে শরবত পান করছি, তাই তিনি পান করতে থাকেন এবং পুরো জগ পান করে ফেলেন, একটা বড় জগ ভর্তি শরবত ছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, পেনশনার মওলা বক্স সাহেব মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব মুবাশ্বেরের বরাতে লিখে পাঠিয়েছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রমযান মাসে অমৃতসর আসেন, সেখানে তাঁর বক্তৃতা ছিল মুন্ডুয়া বাবু

বেনিয়া লাল-এ যার বর্তমান নাম হলো ‘বন্দে মাতরম পাল’। সফরের কারণে হুযূরের হুযূর রোযা রাখেন নি। বক্তৃতা চলাকালে মুফতি ফজলুর রহমান সাহেব হুযূরকে চায়ের পেয়ালা দেন, হুযূর এদিকে দৃষ্টি দেন নি, তিনি আরো কিছুটা এগিয়ে আসেন, তখন হুযূর বক্তৃতায় ব্যস্ত ছিলেন, এরপর মুফতি সাহেব পেয়ালা তাঁর আরো কাছে নিয়ে আসেন, হুযূর তা থেকে এক চুমুক পান করেন। তখন মানুষ হৈ-চৈ আরম্ভ করে যে, এই হলো রমযান মাসের সম্মান, ইনি রোযা রাখেন না। তারা অশালীন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে এবং বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। হুযূর পর্দার অন্তরালে বা পিছনে চলে যান। গাড়ী দ্বিতীয় দিক থেকে দরজার সামনে আনা হয়, হুযূর এতে প্রবেশ করেন, মানুষ ইট-পাথর ইত্যাদি ছুঁড়তে আরম্ভ করে, অনেক হৈচৈ করে, গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায়, হুযূর নিরাপদে তাঁর আবাসস্থলে পৌঁছে যান। একজন বর্ণনাকারী বলেন, পরে শোনা গেছে যে, একজন অ-আহমদী মৌলভী এসব কিছু সত্ত্বেও বলত, আজকে মানুষ মির্যাকে নবী বানিয়ে দিয়েছে, আমি স্বয়ং তাঁর মুখে একথা শুনিনি। এরপর হযরত মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের সাথে আমরা বাহিরে যাই। আমি তাঁকে বললাম, মানুষ ইট-পাথর ছুড়ছে, হৈ-হট্টগোল হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর বের হন, তখন খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, মানুষ যাকে পাথর মারত তিনি চলে গেছেন, আমাকে কে পাথর মারবে। যেহেতু মুফতি ফজলুর রহমান সাহেবের চা পরিবেশনের কারণে এই হৈচৈ এবং গণ্ডগোল আর হট্টগোল হয়, তাই সবাই তাকে বলতে আরম্ভ করে, তুমি কেন এমনটি করলে? সব আহমদী তাকে দোষারোপ করতে থাকে। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, আমিও তাকে এমনটিই বললাম, তিনি পরে বিরক্ত হয়ে যান আর মিয়াঁ আব্দুল খালেক মরহুম আমাকে বলেন, এই বিষয়টি যখন হুযূরের সামনে উপস্থাপন করা হয় যে, মুফতি সাহেব অনর্থক বক্তৃতা নষ্ট করেছেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মুফতি সাহেব কোন অপছন্দনীয় কাজ করেন নি। এটি আল্লাহ্ তা’লার একটি নির্দেশ যে, সফরে রোযা রাখবে না বা রাখা উচিত নয়, আল্লাহ্ তা’লা আমাদের এই কাজের মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। যিনি এটি লিখছেন তিনি একথাও লিখেছেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উত্তর শুনে মুফতি সাহেবের সাহস আরো বেড়ে যায়।

অসুস্থ হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, একবার লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর রক্তচাপ কমে যায় এবং হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে। তখন সূর্য ছিল ডুবন্তপ্রায়, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি সব সময় শরীয়তের সহজ পন্থাকে প্রাধান্য দিতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, এই অধম বর্ণনা করছে যে, হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) সম্পর্কেও এমনটিই দেখা যায় যে, **তিনি** সব সময় দু’টো বৈধ পথের মাঝে সহজ পথকে বেছে নিতেন।

একবার প্রশ্ন করা হয় যে, অনেক সময় রমযান মাস এমন মৌসুমে আসে যখন কৃষকদের কাজ অনেক বেশি থাকে, যেমন ফসল রোপন বা কাটার মৌসুম ইত্যাদি। যারা শ্রমজীবী এমন শ্রমিকদের জন্য রোযা রাখা সম্ভব হয় না, এ সম্পর্কে শিক্ষা কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আল আ'মালু বিন্ নিয়্যত'** এরা নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে, তাক্বওয়া এবং পবিত্রতার নিরিখে নিজের অবস্থা মানুষ যাচাই করতে পারে, কেউ যদি মজদুরী করা সত্ত্বেও রোযা রাখতে পারে তাহলে তার রাখা উচিত নতুবা সে রুগীদের মাঝে গণ্য হবে, এরপর সুযোগ হলে রাখতে পারে। বিশেষ করে গরমের দিনগুলো অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে আর যেসব দেশে তাপমাত্রা অনেক বেশি হয়ে থাকে, ভয়াবহ হয়ে থাকে, সেসব দেশ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এই মজদুরীর কারণে তারা পরে রোযা রাখতে পারে। আর وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (সূরা আল্ বাকারা:১৮৫) সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হলো, যাদের শক্তি নেই বা সামর্থ্য নেই বা যারা অপারগ।

রমযানে যারা রোযা রাখতে পারে না এবং ফিদিয়া দেয় এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"একবার আমার হৃদয়ে প্রশ্নোদয় হলো, ফিদিয়া নির্ধারণের কারণ কি? তখন জানতে পারলাম, এটি সামর্থ লাভের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে যেন রোযা রাখার সামর্থ অর্জিত হয়। খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাই শক্তি যুগিয়ে থাকে, তাই সবকিছু তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। খোদা তা'লা সর্বশক্তির আধার। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা-রোগীকেও রোযা রাখার সামর্থ দিতে পারেন। ফিদিয়ার উদ্দেশ্যই হলো, সেই শক্তি লাভ করা আর এটি খোদার কৃপাগুণেই লাভ হয়। অতএব আমার মতে এভাবে দোয়া করলে খুব ভাল হয়, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এটি তোমার আশিসপূর্ণ একটি মাস, অথচ আমি এ থেকে বঞ্চিত। জানি না, আগামী বছর বাঁচব কি না কিংবা বাদ পড়া রোযাগুলো রাখতে পারব কি না? তাঁর কাছে যদি এভাবে শক্তি চায় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন হৃদয়ের অধিকারীকে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন"**। (মলফুযাত ২য় খন্ড নবসংস্করণ পৃ: ৫৬৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, ফিদিয়া দিলেই রোযা মাফ হয়ে যায় না বরং দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, এই বরকতময় দিনগুলোতে শরীয়তের অনুমদিত কোন বৈধ কারণে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে একত্রে রোযা রাখা সম্ভব হয়। এই যে ছাড়, এটি দু'ধরণের হয়ে থাকে, একটি সাময়ীক, আরেকটি স্থায়ী। ফিদিয়া সাধ্যানুসারে উভয় অবস্থায় দেয়া উচিত। এক কথায় কেউ ফিদিয়া দিলেও এক বছর, দু'বছর বা তিন বছর পর যখনই তার স্বাস্থ্য অনুমতি দেয়, তাকে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, পূর্বের রোগ সাময়িক ছিল আর স্বাস্থ্য লাভের পর তার রোযা রাখার সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই যদি পুনরায় সে স্থায়ীভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে ফিদিয়া দেবে। বাকী যে খাবার খাওয়ানোর সামার্থ্য রাখে সে যদি অসুস্থ হয়, বা মুসাফির হয় তাহলে তার জন্য আবশ্যক হবে রমযান মাসে একজন মিসকিনকে ফিদিয়া স্বরূপ খাবার খাওয়ানো আর বছরের অন্য সময় সে রোযা রাখবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি এটিই ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সব সময় ফিদিয়াও দিতেন পরে আবার রোযাও রাখতেন আর অন্যদেরকেও এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশই দিতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একটি প্রশ্ন করা হয়, যে ব্যক্তি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না বা যে সক্ষম নয় তার এর বিনিময়ে মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হয়, এ খাতে যা ব্যয় হয় তা এতিম ফান্ডে বা এতিম তহবিলে অথবা জামাতের ব্যবস্থাপনার হাতে সেই অর্থ দেয়া বৈধ কি না? হুযূর বলেন, একই কথা, শহরে মিসকীনকেও খাওয়াতে পারে বা এতিম ও মিসীকন তহবিলেও দিতে পারে, কোন পরিচিত ব্যক্তির যদি রোযা খোলাতে চায় বা ইফতার করাতে হয় তাহলে তাও করা যেতে পারে।

অজান্তে পানাহার করলে রোযা ভাঙ্গে না, এই বিষয়ে তাঁর সামনে (এক ব্যক্তির) একটি চিঠি উপস্থাপন করা হয়, রমযান মাসে সেহেরির সময় অজান্তে ভেতরে বসে খাওয়া অব্যাহত রাখি আর বাহিরে এসে দেখি যে, ফর্শা হয়ে গেছে, আমার জন্য সেই রোযা পরে রাখা আবশ্যক কি না? উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অজান্তে খেলে বা পান করলে সেই রোযার স্থলে আরেকটি রোযা রাখা আবশ্যক নয়। ভুলবশতঃ খেলে কোন অসুবিধা নেই।

বয়সের প্রশ্ন, কোন্ বয়সে রোযা রাখা উচিত, অনেক বাচ্চাও জিজ্ঞেস করে আর বয়স্করাও। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত, শরীয়ত অপ্রাপ্তবয়স্কদের রোযা রাখতে বারণ করেছে কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে রোযা রাখার অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমার যতটা মনে পড়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ১২ বা ১৩ বছর বয়সে প্রথম রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু কোন কোন নির্বোধ ৬/৭ বছরের শিশুদের রোযা রাখতে বাধ্য করে আর মনে করে, আমরা পুণ্যের ভাগী হব। এটি পুণ্য নয় বরং এটি একটি অন্যায়। কেননা এটি দৈহিক উন্নতি ও বিকাশের বয়স। অবশ্য যৌবনে পদার্পনের নিকটবর্তী সময়ে, যখন রোযা আবশ্যক হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন রোযা রাখার চর্চা অবশ্যই করানো উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুমতি ও রীতিকে যদি দেখা হয় তাহলে ১২/১৩ বছর বয়সে কিছুটা অভ্যাস করানো উচিত এবং প্রত্যেক বছর কয়েকটি রোযা রাখানো উচিত যতদিন না বয়স ১৮ হয়, যা আমার মতে রোযার জন্য পূর্ণ বয়স।প্রথম বছর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে শুধু একটি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন, অর্থাৎ ১২/১৩ বছর বয়সে হুযূর শুধু ১টি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এ বয়সে শুধু রোযার একটা উৎসুক্য থাকে, সেই আগ্রহের কারণে বাচ্চারা বা ছেলে-মেয়েরা বেশি রোযা রাখতে চায়, তখন পিতা-মাতার উচিত তাদের বারণ করা। এরপর বয়সের এক পর্যায়ে বাচ্চাদের উৎসাহ যোগানো উচিত যেন কয়েকটি হলেও তারা রোযা রাখে। কিন্তু শৈশবে বারণ করা উচিত, বেশি রোযা রাখতে দেয়া উচিত নয়। আর যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন উৎসাহিত করা উচিত, একই সাথে এটিও দেখা উচিত, বেশি রোযা যেন না রাখে। আর যারা দেখে তাদের আপত্তি করা

উচিত নয় যে, সব রোযা কেন রাখে না। কেননা কিশোর-কিশোরীরা যদি এই বয়সে সবগুলো রোযা রাখে তাহলে পরে আর রাখতে পারবে না, অনুরূপভাবে কোন কোন ছেলে-মেয়ে গঠনগত দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে। আমি দেখেছি অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়েদের সাক্ষাতের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসে, আর বলে, এর বয়স ১৫ বছর অথচ দেখতে মনে হয় ৭/৮ বছর বয়স্ক। আমার কাছেও এমন অনেকেই আসে। তিনি (রা.) বলেন, আমি মনে করি এমন ছেলে মেয়ে হয়ত ২১ বছর বয়সে রোযার জন্য সাবালক হবে। পক্ষান্তরে এক সুঠাম বালককে হয়ত ১৫ বছর বয়সেই ১৮ বছরের মনে হয় কিন্তু যদি আমার এই শব্দগুলো নিয়ে যদি সে সঠতা প্রদর্শন করে যে, রোযার জন্য উপযুক্ত হওয়ার বয়স হলো ১৮ তাহলে সে আমার ওপরও যুলুম করবে না আর খোদার বিরুদ্ধেও অন্যায় করবে না, বরং নিজ প্রাণের ওপর নিজেই অন্যায় করবে। অনুরূপভাবে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা যদি রোযা না রাখে আর মানুষ তার সমালোচনা করে তাহলে এমন সমালোচনাকারী নিজের বিরুদ্ধেই অন্যায় করবে।

হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় জ্যেষ্ঠ দুহিতা ছিলেন, তিনি বলেন, যৌবনে পদার্পণের পূর্বে স্বল্প বয়সে তিনি (আ.) রোযা রাখানো পছন্দ করতেন না, দু'একটি রোযা রাখাকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। হযরত আম্মাজান আমার প্রথম রোযা রাখিয়েছেন, মানুষকে ইফতারির দাওয়াত দিয়েছেন, জামাতের সব মহিলাদের ডেকেছেন। এই রমযানের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রমযানে আমি আবার রোযা রাখি, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলি, আজকে আমি আবার রোযা রেখেছি। তিনি কক্ষেই ছিলেন, পাশের টুলে দু'টো পান ছিল, খুব সম্ভব হযরত আম্মাজান বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি একটি পান হাতে নিয়ে আমাকে বলেন, নাও এই পান খাও, তুমি দুর্বল, রোযা রাখবে না, রোযা ভেঙ্গে ফেল। আমি পান খেয়ে ফেলি, একই সাথে বলি, সালেহা অর্থাৎ ছোট মামার স্ত্রীও রোযা রেখেছেন, তিনিও স্বল্প বয়স্কাই ছিলেন, তার রোযাও ভাঙ্গিয়ে দিন। মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাকে ডাক। আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি আসলে মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দ্বিতীয় পান ধরিয়ে দেন আর বলেন খাও, তোমার রোযা নেই, আমার বয়স হয়ত তখন ১০ বছর হবে।

অনুরূপভাবে তারাবী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়। গোলেকীর আকমল সাহেব লিখিতভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান শরীফে রাতে উঠা এবং নামায পড়ার তাকিদ রয়েছে, কিন্তু সচরাচর পরিশ্রমী মজদুর বা শ্রমিক ও কৃষকরা এমন কাজের ক্ষেত্রে আলস্য দেখায়, তাদেরকে রাতের প্রথম প্রহরে যদি তাহাজ্জুদের পরিবর্তে ১১ রাকাত নামায পড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তা বৈধ হবে কি না? হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কোন অসুবিধা নেই, তারা পড়ে নিতে পারে।

তারাবী সম্পর্কে নিবেদন করা হয় যে, এটি যেহেতু তাহাজ্জুদ তাই ২০ রাকাত পড়া সম্পর্কে হুযূরের মতামত কি? তাহাজ্জুদ তো বেতেরসহ ১১ বা ১৩ রাকাত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর স্থায়ী রীতি হলো ৮ রাকাত পড়া, তিনি তাহাজ্জুদের সময়ও তা-ই পড়তেন আর এটিই উত্তম। কিন্তু রাতের প্রথম প্রহরে পড়াও বৈধ, তাহাজ্জুদের সময় উঠে ৮ রাকাত পড়াই যুক্তিযুক্ত বা যথোচিত, কিন্তু রাতের প্রথম প্রহরে পড়লেও তা বৈধ, অর্থাৎ ঘুমানোর পূর্বে। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এটি পড়েছেন। ২০ রাকাত পরে পড়া হয়েছে কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রীতি তাই ছিল যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০ রাকাত বা বেশি রাকাত সংক্রান্ত কথাগুলো পরের। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি হলো ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়া।

এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে একটি পত্র লিখে যার সারাংশ হলো, সফরে কীভাবে নামায পড়তে হয় আর তারাবী সম্পর্কে কি নির্দেশ? তিনি (আ.) বলেন, **সফরে দু'রাকাত নামায পড়াই সুন্নত, আর তারাবীও সুন্নত, তাও পড়ুন, ঘরে একাও পড়তে পারেন। তারাবী আসলে তাহাজ্জুদ, নতুন কোন নামায নয়। আর বেতের যেভাবে পড়ে থাক সেভাবেই পড়।**

অতএব, রমযান সংক্রান্ত এই কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে রমযানের রোযা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।